মিলনসাগর
www.milansagar.com

বটুকদার কথা আমার যেটুকু মনে পড়ে

প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের সন্ধ্যায় স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে আসে। তাই আমার অনেক আগের একটি লেখাকে অনুসরণ করে এই লেখাটি দিলাম।— প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ের প্রান্তবর্তী আন্ধেরীতে আমাদের সেনট্রাল ট্রুপ-এর আস্তানা। বাড়িটি বেশ বড়সড়— চারিদিকে প্রচুর গাছপালা দিয়ে ঘেরা। দূরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। জনবসতি খুব একটা নেই। তখন আমাদের প্রতিবেশী বলতে ছিল কিছু জার্মান যুদ্ধবন্দী!

ভোরবেলা— মানে শেষ রাত। তারাগুলি তখনো ম্লান হয় নি। চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ঝকঝক্ করছে। নাচের ছেলে-মেয়েরা তখনও ঘুমিয়ে। ওদের শরীর-চর্চা একটু দেরিতে শুরু হয়। এমনি একটা সময়ে উঠে তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করতে বসেছি। রবুদার (রবিশঙ্কর) কাছে লেখা একটি ভোরবেলাকার সুরে—"জাগো জাগো মুসাফির...নয়া অরুণ হয় উদয়.....।" হঠাৎ পিঠের ওপর একখানি স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ পেলাম। চেয়ে দেখি বটুকদা। আমার সঙ্গে তিনিও গলা মেলালেন। গেয়ে চললেন— ভৈরোঁ....আশাবরী...ভৈরবী....। বটুকদা এইরকমই। নিঃশব্দে কাছে চলে আসতেন। বিনা ভূমিকাতেই আপন করে নিতে পারতেন যে কাউকে।

বটুকদার সঙ্গে আমার পরিচয় গণনাট্যের গান গাইতে গিয়ে। তিনি গান বাঁধতেন, সুর দিতেন ও আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেন। দৈনন্দিন নানান তুচ্ছ কথা— কাজের মধ্যে তাঁকে পেতাম অতি সহজ ভাবে। সহজাত ক্ষমতায় আশ্চর্য গল্প বলতেন, নির্মল হাস্যে মাতাতেন সবাইকে। এই সঙ্গীতপ্রেমিক সহজ মানুষটিকে আর সবাকার মতোই ভালোবেসে ফেলেছিলাম— তাঁর প্রতিভার অসামান্যতার কথা জানতে বা বুঝতে পারার অনেক আগেই। তাঁর গানের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের আবেদনটিও ছিল গভীর অথচ সহজ। তখন ৫০-এর মন্বন্তর। বাঙলা জুড়ে বাচ্চা-কোলে মেয়েদের কণ্ঠে একটি মাত্র সুর ভেসে বেড়াচ্ছে "মাগো একটু ফ্যান দাও।" আমি তখন ছাত্রী, রাজসাহীতে। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খুলে বিদেশী শাসক সৃষ্ট ঘায়ে প্রলেপ দিচ্ছি মাত্র। এমন একটা সময় হাতে এল বিনয় রায়ের লেখা একটি গান লিফলেটের আকারে। আমরা তাতে নিজেদেরই জানা প্রভাতী সুর লাগিয়ে প্রভাত ফেরী করে পথে পথে গাইতাম :

"জাগো জাগো ভারতবাসী
আর কত ঘুমাবি রে!
নিজভূমে পরবাসী গোলামীর সর্ব্বনাশী
শৃঙ্খল কতকাল রবে রে!!"

আর মাঠে মাঠে গেয়েছি হরিপদ কুশারীর লেখা গান—"সোনার বাংলা হল শ্মশান, এক সাথে সব চল"—গান গাওয়াটা যে আন্দোলনের প্রতিবাদের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে সেটা

মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কমরেডলাল বন্দীর সংকলন" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

অস্পষ্টভাবে হলেও মনে জাগতে শুরু করেছে। এই সময়কার ক্ষুধা-বিদীর্ণ বাঙলার বুক থেকেই সেদিন জন্ম নিয়েছিল কবি ও সুরকার জ্যোতিরিন্দ্রের 'নব-জীবনের গান', এ হল সেই সময় যখন "গান ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে আসে পথে কঙ্কাল-সার ধ্বনি।" রাজসাহী থাকাকালীন নব-জীবনের গান শেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কারণ কলকাতার গানের জোয়ার পদ্মার পাড়ে পৌঁছতে অনেক দেরি হত। তাই পিছিয়ে পড়া পুব-বাঙলার শহর থেকে প্রথম যখন মহানগরীতে এলাম, তখনই সে সুযোগ হল। কখন কোন সময় মনে নেই। একদিন মহম্মদ আলি পার্কে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম শুনলাম 'মধুবংশীর গলি' শম্ভুদার কণ্ঠে। এই প্রথম পরিচয় পেলাম কবি জ্যোতিরিন্দ্রের। তারপর ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একদিন দেখলাম 'নব-জীবনের গান'-এর অপেরা। আমার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অনুভূতি। গানের ভাষা সুর শুধু নতুনই নয়, তাদের এমন অপূর্ব মিলন রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছাড়া আর কোথাও পাই নি। প্রতিটি গান আমাদের উচ্চাঙ্গ সুরে বাঁধা, নয়তো বাঙলার পল্লীগীতির সুর জড়ানো। "দরবারী কানাড়াকে রাজদরবার থেকে আমি এনেছি মানুষের দরবারে, পথের দরবারে।" একথা বটুকদা বারবার বলেছেন। যে করুণ রাগিণীতে বিরহিণী কাঁদে তার প্রিয়জনের ব্যথায়, সেই সুরেই বটুকদা জানিয়েছেন— "ধ্যানের মানুষে আজ মিশে গেছে হাজার মানুষ।" আবার বলিষ্ঠতার সুরে বলেছেন— "মিথ্যা এ হাহাকার ধ্যান ভাঙো।" ভোর বেলাকার প্রভাতী রাগে মানুষের মুক্ত জীবন-প্রভাতের নির্দেশ দিয়েছেন—

"ঐ বুঝি প্রভাতের প্রথম আলোর চূড়া
দূরে দেখা যায়।"

মনে পড়ে ঋত্বিক (ঘটক)-এর এই লাইন কটির প্রতি একটা আশ্চর্য দুর্বলতা ছিল। দেখা হলেই এই দুটো লাইন শুনতে চাইত। ওর ছবিগুলোতেও তাই বটুকদার গানের এই কটি পংক্তি উচ্চারিত হয়েছে বারবার।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সাল নাগাদ চলে গিয়েছিলাম বম্বেতে গণনাট্যের কেন্দ্রীয় আন্দোলনের তাগিদে। আন্ধেরীতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাদিনই চলত আমাদের নাচ-গান ও ব্যালের প্রস্তুতি। বিনয়দা লিখতেন বাঙলা গান, প্রেম ধাওয়ান হিন্দীতে। আর শান্তিদা-শচীন ও শর্মার চলত নানা রকমের নাচের প্রস্তুতি ও মহড়া। এরপর কিছুদিন রবুদাও (রবিশঙ্কর) এসেছিলেন আমাদের মাঝে। আমাদেরই অনুরোধে তিনি কবি ইকবালের "সারে জঁহা সে আচ্ছা" গানটিতে সুর সংযোজন করেছিলেন, যে গান আজ সারা ভারতে প্রায় জাতীয় সঙ্গীতের মতোই গাওয়া হয়ে থাকে। এরই মাঝে সেই আন্ধেরীতে একদিন বটুকদা এসে হাজির। বম্বেতে তিনি বেড়াতে আসেন নি। এই সৃষ্টিপাগল মানুষটি এসেছিলেন সঙ্গীতসৃষ্টির তাগিদে। পরে বৌদির কাছে (বটুকদার স্ত্রী) শুনেছিলাম যে তখন বটুকদার ছেলে খুবই অসুস্থ। হঠাৎ একদিন বটুকদাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো খবর নেই। একদিকে অসুস্থ ছেলে, আর-একদিকে বটুকদার জন্য চিন্তা। একমাস পর হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলেন— "আমি বম্বেতে এসেছি।" অসম্ভব স্নেহশীল, সংসারী মানুষ, অথচ সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারতেন বটুকদা শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রেরণাতেই। তা নইলে বোধহয় সৃষ্টি করা যায় না।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

আন্ধেরীতে সারাদিনের কাজ শেষ করে আমরা সবাই শুয়ে পড়তাম। কিন্তু অনেকরাত পর্যন্ত দু-তিন জনের গলার আওয়াজ রোজই পাওয়া যেত। শান্তিদা-বিনয়দা ও বটুকদার গলা। পরে বুঝতে পারি সে ছিল বটুকদার নতুন রচনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। রবুদা থাকতেন একটু দূরে ঐ একই বাড়ীতে, বৌদি অন্নপূর্ণা ও ছেলে সুভোকে নিয়ে। এমনিভাবে আমরা একদিন দেখি আমাদের জন্য নাচের একটি নতুন item প্রস্তুত, 'গাজন'। শিবের গাজন— হর-পার্বতীর দলের ঝগড়া।

"(একদিকে) নন্দী নাচে ভৃঙ্গী নাচে ভূতের দল।
(আবার) ডাকিনী যোগিনী নাচে শিবারা সকল।"

এই দুই দলের নাচের পরীক্ষাটা বটুকদা করেছিলেন বিভিন্ন রসের পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন হাস্যরস, ভয়াবহ রস, শৃঙ্গার রস ইত্যাদি। অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতুড়ে ছন্দ তৈরি করেছিলেন তাঁর ভাষা ও বোল দিয়ে যেমন—

"খট্ খট্ খটাখট কঙ্কাল বাজে
দ্রিম দ্রিম ধ্রামাদিম ধুপ—
খল খল খল খল অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

তারপর আবার ভরিয়ে তুলতেন শৃঙ্গার রসে, অপূর্ব মিষ্টি কীর্তনের সুরে—

"নব ঠমকে নাচিছে রাই....
নব জলধর শ্যাম সোহাগিনী
মরি বলিহারী যাই॥"

এই সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হত শুধুমাত্র তিনিটি যন্ত্র নিয়ে— বাঙলার ঢাক, ঢোল ও কাঁসর। ঢাকের সমস্ত বোলই ছিল বটুকদার দেওয়া। আর শিব, দুর্গা, নন্দী-ভৃঙ্গী সবার পোশাক ছিল পুরো চটের। চটের ওপর সুন্দর করে এঁকেছিলেন চিত্ত দা (চিত্তপ্রসাদ)। এই অনুষ্ঠানটি 'অমর-ভারত' ব্যালের সঙ্গে বহুবার কলকাতায় দেখানো হয়েছে। যাঁরা সে জিনিস দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সম্পূর্ণ হল ঘরটি ভরে উঠত অদ্ভুত এক জমাটি অনুষ্ঠানে— ঢাক ও ঢোলের অপরূপ বোলে।

বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি স্বদেশী গানেও বটুকদা সুর সংযোজনা করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের গান "কদম কদম বঢ়ায়ে যা" আকাশবাণী কলকাতা থেকে আমরা ১৫ই আগস্টের পর গেয়েছিলাম বটুকদার সুরে। শিবরঞ্জনীতে রচেছিলেন তারানা, কবি ইকবালের লেখা "রুলাতা হ্যায় তেরা নজারা হ্যায় হিন্দোস্তাঁ তুঝকো"— দেশমাতার এই কাতর আবেদন— "ন সমঝোগে তো মিট যাও গে।" আর সুর দিলেন বিসমিলের গান— "সরফরোসী কি তামান্না অব হমারে দিল মে হ্যায়"— প্রকৃত কাওয়ালীতে। এই প্রতিটি গানই প্রচলিত গানগুলির চাইতে অনেক প্রাণস্পর্শী ও উচ্চাঙ্গের। আর "এস মুক্ত কর" তো আছেই। অনেকে হয়তো জানেন না যে গণনাট্য সংঘের অ্যানথেম ছিল বটুকদারই লেখা আর একটি গান—

"আমরা সবাই মিলেছি হেথায়
মিলেছি দেহে ও মনে।
ভারতীয় গণনাট্য সংঘে
(নব) যুগ সন্ধিক্ষণে॥"

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কত্রালবাস বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

কিন্তু তাকে সরিয়ে দিয়ে "এস মুক্ত কর" তার আপন স্থান করে নিয়েছে, বোধহয় তার ডাক আরও বৃহত্তর শিল্পী-সমাজের কাছে পৌঁছয় বলে।

এর পরবর্তী একটা অধ্যায় বটুকদা কাটান দিল্লীতে। এখানে তাঁর স্রষ্টা-মন অলস হয়ে বসে ছিল না। তিনি এবং বিনয়দা মিলে মাতিয়ে রাখতেন করোলবাগের বঙ্গীয় সংসদ। 'ফাল্গুনী' থেকে 'লম্বকর্ণ' পালা সব কিছুই তাঁর প্রযোজনায় অপূর্ব রূপ নিত। কিন্তু এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বোধহয় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এ সুর সংযোজনা করে সৃষ্টি তাঁর 'রামলীলা'। তখন তিনি ছিলেন ভারতীয় কলাকেন্দ্রে। আমরা সৌভাগ্য হয়েছিল সে সময় (১৯৫৯ সাল নাগাদ) প্রায় এক বছর নানান জায়গায় বটুকদার সঙ্গে সব গান গেয়ে বেড়ানোর। বটুকদার এ রচনাটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দিভাষী সাধারণ মানুষের প্রাণের জিনিস। কত দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ লক্ষ সাধারণ গ্রামের মানুষের মধ্যে রস সিঞ্চন করে এসেছে এই কাব্য। বটুকদাতো বাঙলাদেশের মানুষ। কিন্তু কোনো এক আশ্চর্য ক্ষমতার বলে তুলসীদাসের মূল সুরটাকে তিনি তাঁর গানে ধরে ফেলেছিলেন। রাম লক্ষণের জন্মের দৃশ্যের সুর শুনে মনে হয় দেহাতী মেয়েরাই গাইছে তাদের গ্রামের নব জাতককে ঘিরে। গুহকের ভক্তি, শবরীর ব্যথা কিংবা রামের যন্ত্রণা— সবই তাঁর সুরে এক অপূর্ব সুষমা পেত। গান গেয়ে ছাড়া তা বোঝানো সম্ভব নয়।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। উচ্চারণ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য বিখ্যাত এক হিন্দী কবির কাছে আমাদের যেতে হয়েছিল। সমস্ত 'রামলীলা'টা শুনে তিনি অভিভূত হয়ে বললেন — "অপূর্ব হয়েছে। ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার। ভারতবর্ষে আর কেউই এ জিনিস করতে পারে নি।"

'রামলীলা'র পুরুষ কণ্ঠের সমস্ত গানই বটুকদা নিজে গাইতেন। বটুকদাকে এত বিভোর হয়ে গাইতে আমি আর কখনও দেখি নি। আমিও এই গানগুলি শুনে অভিভূত হয়ে পড়তাম। শুধু শোনা নয়, আমি নিজেও যখন শবরীর গান গাইতাম— "হমারো রাম ন আজ হু আয়ো"— মনে হত আমিই শবরী। সুরের এ আবেদন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও গানে আমি পাইনি। কলকাতার রাজনীতি-সচেতন সংস্কৃতির জগতে সমাদৃত বটুকদাকে তো আমরা আগে থেকেই চিনতাম। কিন্তু 'রামলীলা'য় প্রকাশ পেল তাঁর নতুন এক দিক। এখানে তাঁর গান এসে মিশল ভারতীয় সংস্কৃতির চিরায়ত ধারাটির সঙ্গে। সম্ভবত এই কারণেই এই নৃত্যনাট্যটির আবেদন ছিল সর্বজনীন। বিদগ্ধ হিন্দী কবি থেকে শুরু করে শ্যামলীর চিনিকলের মজুর বা মীরাট ক্যান্টনমেন্টের জওয়ান— সবাইকেই অভিভূত হতে দেখেছি 'রামলীলা' শুনে। আজকাল যখন হিন্দি ফিল্মে ও নানা জায়গায় দেশি-বিদেশী সুরের কৃত্রিম সংশ্লেষণ চলেছে তখন বটুকদার গানের কথা আরও বেশি করে মনে পড়ে।

এরই পাশাপাশি একটা করুণ স্মৃতি আমার মনে এখনও বিঁধে আছে। 'ভারতীয় কলাকেন্দ্র'য় যোগ দিয়ে বটুকদা 'রামলীলা' সৃষ্টি করেন। কলাকেন্দ্র পরিচালনা করতেন প্রধানত কয়েকজন মিল-মালিকের স্ত্রী। এইসব মাননীয়ারা শিল্পীদের খুব সামান্য মাহিনা দিতেন। বটুকদার মতো স্রষ্টা ও পরিচালকের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। আমার এখনও মনে আছে জটায়ুর পার্ট করত একটি খুবই গরিব ঘরের ছেলে। রিহার্সালের সময় বেকায়দায় পা পড়ায় ওর

মিলনসাগর
www.milansagar.com

পায়ের হাড় ভেঙে যায়। কিন্তু কেন্দ্র তার চিকিৎসার সামান্যতম ব্যয়ভারও বহন করেনি। এছাড়াও দেখেছি গীতিনাট্যটি পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে মাঝে মাঝেই হস্তক্ষেপ করতে। এগুলি খুব অসহনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু এ সমস্ত সহ্য করেই বটুকদাকে কয়েক বছর কাটাতে হয়েছে দিল্লীতে। অবশ্য জীবনে বহু জিনিসকে উপেক্ষা করে চলতে জানতেন তিনি। সুস্থ প্রাণশক্তির একটা অফুরন্ত উৎস ছিল ওঁর মধ্যে। মীরাটে দেখেছি আগের দিন বহুরাত অবধি 'রামলীলা' পরিচালনা করে পরদিনই ভোরবেলা দলের ছেলেদের সঙ্গে চললেন ফুটবল খেলতে। আবার বিকেলে টেবিল টেনিসও খেলতেন। দিল্লীতে করোলবাগে বিনয়দার বাড়িতে একদিন রাত প্রায় ১১টার সময় আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ শুনলাম সিঁড়ি বেয়ে একটা গান ওপরে উঠে আসছে। "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান— আজি এসেছি....।" উঠে দেখি স্বয়ং বটুকদা। ওপরে এসেই গানটির সঙ্গে নাচ জুড়ে দিলেন— প্রকৃত নাচই— বিনয়দা ও বটুকদা মিলে। সেদিন সত্যিই ছিল পূর্ণিমা। তাই বটুকদাকে আর ঘরে রাখা যায় নি।

বটুকদার কথা বলা সম্পূর্ণ হয় না। যদি আমি বৌদির কথা না বলি। বটুকদার যোগ্য জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন উর্মিলাবৌদি। ব্যক্তিগত জীবনে খ্যাতি ও অর্থকে বটুকদা চিরদিনই উপেক্ষা করে চলেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে তাঁর ওপর অবিচারও কম হয় নি। কিন্তু বটুকদা বা বৌদি কারও কাছ থেকেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো খেদ বা অবিযোগ কখনও শুনি নি। বরঞ্চ দিল্লীর ঐ অল্প মাহিনায় বিরাট ব্যয়ভার বহন করার পরেও বৌদিকে বলতে শুনেছি— "তুমি যদি আমায় গাছতলাতেও দাঁড়াতে বলো, আমি তাই করব।" এমনি করেই আমাদের মিষ্টিস্বভাব বৌদি বটুকদাকে তাঁর সমস্ত কাজেই আত্মত্যাগ ও সহানুভূতি দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, সাহায্য করেছেন।

দিল্লী থেকে অবসর নিয়ে বটুকদা চলে এলেন কলকাতায়। বটুকদাকে আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়ে আমরা খুবই উৎসাহিত। কিন্তু অবকাশ তাঁর হয়নি। শেষের দিনগুলি তিনি যেন আরও বেশি করে নিজেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের "কচি কচি বাঁশপাতার মতো হাত" তুলে 'বটুকদা মিস'-এর সুরের খেলা ও ছন্দে মাতত। সাধারণ ছেলেদের, যারা তথাকথিত সংস্কৃতিবান পরিবারভুক্ত নয়, নিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের দল 'জগঝম্প' গড়ে তুলেছিলেন। এই অভিনব অর্কেস্ট্রার যন্ত্র ছিল হাঁড়ি, কাঠের বা বাঁশের টুকরো, লোহার টুকরো, বাঁশি ইত্যাদি। কলকাতার মাঠ-ময়দান তো আছেই। তা ছাড়াও ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া যেখানে যখন কেউ ডেকেছেন— সেখানেই বটুকদা গেছেন। বটুকদা খুব ভালো সংগঠক হয়তো ছিলেন না। কিন্তু একজন স্রষ্টার কাছ থেকে সাংগঠনিক দক্ষতা আশা করা কি ঠিক? সাধারণ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই আমরা অনুভব করেছি যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে শিল্পী ও সংগঠক আলাদা থাকা প্রয়োজন। স্রষ্টার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখতেই হয়তো তিনি নিজেকে কখনও সাংগঠনিক জটিলতার মধ্যে জড়ান নি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। পথ চলার ধাক্কায় হাতের মুঠি শিথিল হয়ে যায় নি।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ রক্ষীবাহিনী সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দ্র সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

বটুকদার কথা-সম্পূর্ণ হবে না— যদি তাঁর সম্পর্কে এই কথাটুকু না বলি। বটুকদা প্রায়ই আমাদের বলতেন "জানিস্ — পাখির ডাক থেকেই সুরের উৎপত্তি।" তাই পাখি ডাকলে তিনি সব কিছু ফেলে পাখির গান শুনতেন।—

তাঁর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায় দূরদর্শনে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই কথাগুলিই বলেছিলেন। বলেছিলেন যে তাঁর "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবিতে পাহাড়ী সান্যালের চরিত্রটি উনি বটুকদার কথা ভেবেই সৃষ্টি করেছিলেন।

আর বলেছিলেন "এখন তাই পাখির ডাক শুনলে আমার বটুকদার কথাই মনে পড়ে— ভবিষ্যতেও পড়বে।"

বাঙলায় বা তার বাইরে বহুবারই বটুকদার গান গেয়েছি। বটুকদার প্রতিটি গানই গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। কোথায় জানি না এর একটা অন্য ধরনের আবেদন আছে। মাঠে, ঘাটে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গণনাট্যের গান গাইতে গিয়ে বারবার আমাদের চোখের জলের সাড়া শ্রোতাদের সিক্ত চোখে পেয়েছি; আমাদের গলার সঙ্গে জনতার সমবেত কণ্ঠ এসে মিলেছে। তাই আজ যখন দেখি নতুন ছেলেমেয়েরা অনবরুদ্ধ আবেগের প্রকাশ খোঁজে পাশ্চাত্যের পপ গানে, তখন বড় দুঃখ হয়; ভাবি আমাদের সেই আন্দোলনের উৎসটা কোথায় হারিয়ে গেল।

কিন্তু বটুকদার কথা অনুযোগ বা হতাশার মাঝে শেষ হতে পারে না। সমস্ত গ্লানি সমস্ত তুচ্ছতাকে হারিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকে যে সুর তার নামই তো বটুকদা।

একদিন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের শঙ্কা আর মৃত্যুকে অস্বীকার করে জন্ম নিয়েছিল 'নব-জীবনের গান'। বিশ্বাস করি ভাবীকালে তরুণ-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে তা বার বার অস্বীকার করবে বটুকদার মৃত্যুকেও। আর অমরা, পুরনোরা, নতুন গলায় আবার কবে শুনব আমাদের যৌবনে শেখা স্পর্ধার গান :

"না না না — মানব না মানব না
কোটী মৃত্যুরে কিনে নেবো প্রাণপণে।
ভয়ের রাজ্যে থাকব না।
অভয় পেয়েছি নতুন দিনের কাছে।
দিকে দিকে তাই আশার পতাকা নাচে,
পেশীতে পেশীতে রক্তের লাল আলো
ধুয়ে দেবে অমাবস্যার যত কালো
জয়ের রাজ্যে ঢুকবই মোরা থামব না।"

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কত্তালবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দ্র সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া